ব্রেইন রুলস
পেশা, পরিবার ও শিক্ষার সাফল্যে ১২টি মূল নীতি

ব্রেইন রুলস
পেশা, পরিবার ও শিক্ষার সাফল্যে ১২টি মূল নীতি

লেখক : জন জে. মেদিনা
অনুবাদ : ইসরাত জাহান

একমাত্র পরিবেশক
এশিয়া পাবলিকেশনস
৩৮/২ক বাংলাবাজার (মান্নান মার্কেট), ৩য় তলা, ঢাকা-১১০০

উ ৎ স র্গ

সারাব আজমান (আমার জীবনসঙ্গী);
যার সমর্থন, সহানুভূতি এবং অকৃত্রিম ভালোবাসাই আমাকে এই দীর্ঘ অনুবাদ-যাত্রায় সাহস জুগিয়েছে।

অনুবাদকের কথা

'ব্রেইন রুলস' বইটি যখন আমার হাতে আসে, তখন থেকেই এর নাম আমাকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। এক সপ্তাহ সময় নিয়ে আমি বইটি পড়ে শেষ করি। বইটিতে নিউরোসায়েন্সকে দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করার ১২টি সহজ কার্যকরী উপায় নিয়ে আলোচনা করে হয়েছে। এত সহজ আর দারুণ উপস্থাপন, আর সত্যি বলতে নিজের ব্রেইনকে হ্যাক করে কাজে লাগানোর মতো কিছু টিপস এতে রয়েছে।

যেহেতু এর আগেও আমি আত্মোন্নয়ণ-মূলক বেশকিছু বই অনুবাদ করেছি, আমার মনে হয়েছে এই দারুণ বইটিও পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন। সেই ভাবনা থেকেই এই বইটি অনুবাদের কাজে লেগে পড়ি।

অনুবাদ প্রক্রিয়াটি নিঃসন্দেহে একটি চ্যালেঞ্জিং অভিজ্ঞতা ছিল। মস্তিষ্ক এবং নিউরোসায়েন্সের বিভিন্ন পরিভাষা বাংলায় সাবলীলভাবে উপস্থাপন করা সহজ কাজ ছিল না। কিছু শব্দের তো বাংলা পরিভাষাই নেই। সেগুলোকে আবার বোধগম্য করে লিখেছি। প্রতিটা ব্রেইন রুলসে জন মেদিনা উদাহারণ যুক্ত করেছিলেন, কিন্তু বেশিরভাগ উদাহারণই ওয়েস্টার্ন কালচারের, যা সম্বন্ধে বাঙালিরা খুব একটা অবগত নয়। তাই আমি নতুন করে বাংলাদেশের সংস্কৃতির সাথে মিলিয়ে উদাহরণ লিখেছি। লেখকের মূল ভাব অক্ষুণ্ন রেখে ভাষাকে সহজবোধ্য করার চেষ্টা করেছি, যাতে সর্বস্তরের পাঠক বইটি থেকে উপকৃত হতে পারেন।

অনুবাদ কর্মযজ্ঞে যারা আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য ও উৎসাহিত করেছেন, তাঁদের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। বিশেষভাবে, আশরাফুল ইসলাম তুষার (প্রকাশক, এশিয়া পাবলিকেশন) ভাইকে, যিনি আস্থা রেখেছেন এবং ধৈর্যসহকারে আমাকে এতটা সময় দিয়েছেন ভালোভাবে কাজটা সম্পন্ন করার।

পরিশেষে, আমার বিশ্বাস, এই বইটি পাঠকদের মস্তিষ্কের কার্যকারিতা সম্পর্কে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে এবং নিজেদের জীবনকে আরও উন্নত করার জন্য উৎসাহিত করবে। আমি আশা করি পাঠকরা 'ব্রেইন রুলস' বইটি আগ্রহের সাথে পড়বেন এবং এর জ্ঞান নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করে উপকৃত হবেন।

যদি এই অনুবাদ পাঠকের মনে সামান্যতম কৌতূহলও জাগাতে পারে অথবা তাঁদের জীবনযাত্রায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সহায়ক হয়, তবে আমার এই শ্রম সার্থক হবে।

সূ চি প ত্র

সূচনা ১১
ব্রেইন রুলস ১ : বিবর্তন ১৭
ব্রেইন রুলস ২ : ব্যায়াম (EXERCISE) ২৭৫
ব্রেইন রুলস ৩ : ঘুম ৩৭
ব্রেইন রুলস ৪ : চাপ ৪৯
ব্রেইন রুলস ৫ : প্রত্যেকের মস্তিষ্কের গঠন ভিন্ন ৬৮
ব্রেইন রুলস ৬ : মনোযোগ ৮১
ব্রেইন রুলস ৭ : স্মৃতি ৯৫
ব্রেইন রুলস ৮ : সকল অনুভূতিকে সক্রিয় করুন ১২৫
ব্রেইন রুলস ৯ : দৃষ্টি (Vision) ১৩৯
ব্রেইন রুলস ১০ : গান ১৫২
ব্রেইন রুলস ১১ : লিঙ্গ (Gender) ১৭০
ব্রেইন রুলস ১২ : অনুসন্ধান (Exploration) ১৮৬

সূচনা

একবার ভাবুন তো, ৮৩ লক্ষ ৮৮ হাজার ৬২৮ কে মনে মনে ২ দিয়ে গুণ করতে কতক্ষণ লাগবে? পারবেন কি কয়েক সেকেন্ডে গুণ করতে?

একটি ছেলে আছে, যে এই একই সংখ্যা চোখের পলকেই ২৪ বার গুণ করে ফেলতে পারে, আর প্রতিবার তার উত্তর একদম সঠিক হয়!

আরেকটি ছেলে, যে ঘুমের মধ্যেও ঘড়িতে ঠিক কয়টা বাজে বলতে পারে। আর একটি মেয়ে ২০ ফুট দূর থেকে যেকোনো জিনিসের সঠিক মাপ বলে দিতে পারে। যাদের কথা বললাম, তাদের মধ্যে ৬ বছরের একটা ছোট্ট ছেলেও ছিল, যে জীবন্ত আর কঠিন ছবি আঁকতে পারত। অনেকে তো বলে থাকেন যে, তার আঁকা ঘোড়ার ছবি নাকি বিখ্যাত শিল্পী লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির ছবির থেকেও সুন্দর!

এই বিশেষ মানুষগুলোর বুদ্ধি কিন্তু খুব বেশি নয়, কারোই আইকিউ ৭০-এর বেশি নয়। অথচ এদের ব্রেইনের ক্ষমতা দেখলে অবাক হতে হয়। আমাদের ব্রেইন হলো পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা তথ্য আদান-প্রদান করার যন্ত্র। দেখুন না, যেই বইটি পড়ছেন, এখানে সাদা কাগজের ওপর কালো কালি দিয়ে লেখা কয়েকটা দাগ/অক্ষর দেখেই আপনি তার মানে বুঝতে পারছেন।

এই অবিশ্বাস্য কাজটা করার জন্য আপনার মস্তিষ্ক বহুদূরে ছড়ানো কোটি কোটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষের মধ্যে বিদ্যুতের মতো সংকেত পাঠায়! সেই কোষগুলো এত ছোটো যে, এই একটা ছোট্ট বাক্যের শেষেও কয়েক হাজার এঁটে যাবে। চোখের পলক ফেলার আগেই এত কিছু ঘটে যায়। আসলে, আপনার মস্তিষ্ক এই মুহূর্তে ঠিক এই কাজগুলোই করছে। আমাদের মন আর মস্তিষ্ক যে কত আশ্চর্য কাজ করতে পারে, তা আমরা অনেকেই জানি না।

১২টি ব্রেইন রুলস

আমার লক্ষ্য হলো এই বইতে মস্তিষ্কের কাজের পদ্ধতির ১২টি গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্পর্কে তুলে ধরা। আমি এগুলোকে বলি "ব্রেইন রুলস" বা মস্তিষ্কের সূত্র। প্রতিটি সূত্রে বা নিয়মে, আমি বৈজ্ঞানিক তথ্য নিয়ে আলোচনা করব এবং দেখাব কীভাবে এই বিষয়গুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে, বিশেষ করে কর্মক্ষেত্র এবং শিক্ষাক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে। মস্তিষ্ক নিয়ে আলোচনা শুনতে কিছুটা কঠিন মনে হলেও, আমি এর মূল বিষয়গুলো সহজভাবে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করব।

বইটিতে আমি মস্তিষ্কের ১২টি সূত্র বা রুলস নিয়ে আলোচনা করেছি। এটি পড়লে আপনি যে বিষয়গুলো জানতে পারবেন, তার কিছুটা সংক্ষেপে নিচে তুলে ধরা হলো:

আমাদের মস্তিষ্ক কখনোই স্থির থাকে না। কাজ করা, দৌড়ানো বা হাঁটার মতো দৈনন্দিন কার্যকলাপের সময়ও এটি ক্রমাগত বিকশিত হতে থাকে। নতুন কিছু শেখা মস্তিষ্কের সহজাত প্রবৃত্তি। ব্যায়াম (exercise) মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বাড়ায় (ব্রেইন রুলস #২)। যারা নিয়মিত ব্যায়াম করেন, তাদের স্মৃতিশক্তি, মনোযোগ এবং সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা অন্যদের তুলনায় বেশি।

বিরক্তিকর কিছুতে যে মানুষ মনোযোগ ধরে রাখতে পারে না, তা নিশ্চয়ই এতক্ষণে আপনার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই টের পেয়েছেন (ব্রেইন রুল #৬)। একটা লম্বা প্রেজেন্টেশনে কারো মনোযোগ টানতে হাতে গোনা কয়েকটা মুহূর্ত, আর বড়জোর দশ মিনিট ধরে রাখতে পারে। ঠিক নয় মিনিট উনষাট সেকেন্ডের মাথায় আপনাকে এমন কিছু করতে হবে, যা তাদের মনোযোগ আবার ফিরিয়ে আনবে এবং সময়ের কাঁটা নতুন করে ঘুরতে শুরু করবে–সেটা হতে পারে রম্যগল্প, মজা, আবেগপূর্ণ কোনো কথা কিংবা তাদের আগ্রহের সাথে যুক্ত কিছু। আর হ্যাঁ, মস্তিষ্কের একটুখানি বিশ্রামও দরকার। তাই এই বইয়ের অনেক কথা, সহজবোধ্য করতে আমি মাঝে মাঝে গল্পের আশ্রয় নিয়েছি।

দুপুর তিনটার দিকে ক্লান্ত লাগে না? এর মানে হলো মস্তিষ্ক তখন বিশ্রাম চায়। তখন কিছুটা বিশ্রাম নিলে হয়তো আপনি সতেজ অনুভব করবেন। একটা গবেষণায় দেখা গেছে, ২৬ মিনিটের বিশ্রাম নাসা পাইলটদের কর্মক্ষমতা ৩৪ শতাংশ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়। আর যদি আপনি ঠিকমতো বিশ্রাম নেন, তাহলে পরের দিন আপনার মানসিক দক্ষতা আরও ভালো হবে। ভালো ঘুম, ভালো চিন্তা ("ব্রেইন রুলস #৩")।

আমরা এমন একজনের সাথে পরিচিত হব, যিনি একবার কোনো শব্দ দেখার পরই তা মনে রাখতে পারেন। অবশ্য আমরা বেশিরভাগ মানুষই মনে রাখার চেয়ে বেশি ভুলে যাই, আর সেই কারণেই মনে রাখার জন্য আমাদের বারবার পুনরাবৃত্তি করতে হয় (ব্রেইন রুল #৭)। কোনোকিছু মুখস্থ করার জন্য আমাদের বারবার পড়তে হয় ("ব্রেইন রুলস #৫")।

শিশুদের এই পৃথিবী সম্পর্কে বেশি জ্ঞান না থাকলেও, তারা কোনোকিছু কীভাবে জ্ঞান অর্জন করতে হয় তা জানে। আমরা জন্মগতভাবেই শক্তিশালী এবং কৌতূহলী ("ব্রেইন রুলস #১২")। যতক্ষণ

না আমরা নিজেদের মস্তিষ্কে কৃত্রিম পরিবেশ তৈরি করি, ততক্ষণ পর্যন্ত এই স্বভাবের কোনো পরিবর্তন হয় না।

এটি কোনো ডাক্তারি ব্যবস্থাপত্র বা পরামর্শ নয়

এই বইয়ে যা যা বলা হয়েছে, তা কোনো প্রেসক্রিপশন নয়, মানে ডাক্তার যেমন ঔষধ দেন তেমন নয়। এগুলো বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে যা পেয়েছেন, তার ফল।

আমরা মানব মস্তিষ্ক সম্পর্কে এখনও অনেক কিছু জানি না। আমি একজন স্নায়ুবিজ্ঞানী। আমার কাজের বেশিরভাগ সময় আমি ল্যাবে অনেক গবেষণা করেছি। যদিও আমি কাজ করি মনের ডাক্তার হিসেবে, কিন্তু আমার জানার আগ্রহ ছিল আমাদের শরীরের ভেতরের নকশা (জিন বা ডিএনএ) আর একজন মানুষ কীভাবে ব্যবহার করে (আচরণ)–এই দুটোর মধ্যে কতটা তফাত, আর এরা একে অপরের ওপর প্রভাব ফেলে কি না। কোনটা কোন জিন থেকে আসে, তা বলা খুব কঠিন।

মাঝে মাঝে, আমি এমন লেখা আর বই পড়তাম, যেখানে নিউরোসায়েন্স নিয়ে নতুন যা জানা গেছে তার ওপর ভিত্তি করে বলা হতো কীভাবে মানুষের শেখা উচিত আর ব্যবসা করা উচিত। 'মোজার্ট এফেক্ট' তেমনই একটা ধারণা, যেখানে বলা হয় ক্লাসিক গান শুনলে ছাত্ররা নাকি অঙ্কে ভালো করে। অথবা এমন ধারণা যে, যারা হিসাবনিকাশ করে তারা "বাঁ-মাথার" মানুষ আর যারা নতুন কিছু বানায় তারা "ডান-মাথার" মানুষ, আর সবাইকে সেইভাবে চালাতে হবে। কখনও কখনও আমার ভয় লাগত, মনে হতো লেখকরা আমার না পড়া কোনো বই পড়ে ফেলেছেন কি না।

যদিও আমি নিউরোসায়েন্সের অনেক কথা জানি, তবুও কীভাবে ভালো শিক্ষক, বাবা-মা, ব্যবসায়ী বা ছাত্র হওয়া যায়, তা বলার মতো কিছু আমার জানা ছিল না। সত্যি বলতে, মানুষ কীভাবে এক গ্লাস জল তোলে, যদি আমরা সেটাই ভালোভাবে বুঝতে পারি, সেটাই অনেক বড় ব্যাপার হবে। আমার ভয় পাওয়ার দরকার ছিল না।

নিউরোসায়েন্স এখনও পরিষ্কার করে বলতে পারে না যে, কীভাবে ভালো শিক্ষক, বাবা-মা, ব্যবসায়ী নেতা বা ছাত্র হওয়া যায়। প্রতিটা অধ্যায়ের ভেতরে আপনারা যা জানতে পারবেন, তার সাথে আমি প্রতিটা অধ্যায়ের শেষে সেই গবেষণা আমাদের রোজকার জীবনে কীভাবে কাজে লাগানো যায় তার কিছু সহজ উপায়ও বলব। কিন্তু এগুলো কোনো ডাক্তারি পরামর্শ নয়। এগুলো শুধু আইডিয়া। আপনারা যদি সেগুলো চেষ্টা করেন, তবে সেগুলো আপনাদের জন্য কাজ করে কি না, তা দেখার জন্য আপনারা নিজেরাই ছোটখাটো পরীক্ষা করে দেখবেন।

মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা আবরন

মস্তিষ্ক সম্পর্কে আমরা যা কিছু জানি, তার মূলে রয়েছেন বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী এবং জ্ঞানীয় স্নায়ুবিজ্ঞানীরা। তাঁদের পরীক্ষামূলক গবেষণার মাধ্যমেই এই জ্ঞান অর্জিত হয়েছে। তাঁরা মূলত মস্তিষ্কের বিভিন্ন কোষ এবং টিস্যু কীভাবে একে অপরের সাথে সম্পর্কিত, তা নিয়ে গবেষণা করেন। মস্তিষ্কের কার্যকারিতা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান এখনও সীমিত হলেও, এর বিবর্তনকালীন ইতিহাস একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র দেয়। সেই ইতিহাস অনুযায়ী, মানব মস্তিষ্ক এমনভাবে গঠিত হয়েছে যাতে এটি বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে পারে এবং একটি পরিবর্তনশীল পরিবেশে টিকে থাকতে পারে। আমি এই বিষয়টিকে মস্তিষ্কের কার্যকারিতার মূল ভিত্তি বা "কর্মক্ষমতা আবরন" (performance envelope) বলে অভিহিত করি।

এই বইয়ের প্রতিটি বিষয়–যেমন ব্যায়াম, ঘুম, মানসিক চাপ, মস্তিষ্কের গঠন (wiring), মনোযোগ, স্মৃতি, সংবেদী অঙ্গের সমন্বয় (sensory integration), দৃষ্টি, সংগীত, লিঙ্গ (Gender) এবং নতুন কিছু জানার আগ্রহ (exploration)–এই "কর্মক্ষমতা আবরনের" সাথে সম্পর্কিত। আমাদের পূর্বপুরুষরা ছিলেন গতিশীল এবং তাঁরা প্রচুর পরিমাণে শারীরিক পরিশ্রম করতেন। পরিবেশের পরিবর্তনশীলতা আমাদের মস্তিষ্ককে অত্যন্ত নমনীয়ভাবে কাজ করতে সাহায্য করত, যার ফলে আমরা অনুসন্ধিৎসু হয়ে সমস্যার সমাধান করতে পারতাম। প্রকৃতির বিশাল আঙিনায় টিকে থাকার জন্য আমাদের ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া অপরিহার্য ছিল। এর অর্থ হলো কিছু নির্দিষ্ট জিনিসের প্রতি মনোযোগ দেওয়া, এমনকি অন্য কিছুর ক্ষতি হলেও, এবং একটি বিশেষ উপায়ে স্মৃতি তৈরি করা। যদিও আমরা গত কয়েক দশক ধরে মস্তিষ্ককে শ্রেণিকক্ষ এবং ছোটো অফিসের cubicle-এর মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছি, সত্যি বলতে আমাদের মস্তিষ্ক মূলত জঙ্গল এবং তৃণভূমিতে বেঁচে থাকার জন্যই তৈরি হয়েছিল। আমরা এখনও সেই মৌলিক গঠন থেকে খুব বেশি দূরে যাইনি।

এর প্রধান কারণ হলো আমরা আমাদের মস্তিষ্কের কার্যকারিতা সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারি না। আমরা একই সাথে সেলফোনে কথা বলার চেষ্টা করি এবং গাড়ি চালাই, যদিও মনোযোগের ক্ষেত্রে আমাদের মস্তিষ্কের পক্ষে একই সময়ে একাধিক কাজ করা (মাল্টিটাস্কিং) আক্ষরিক অর্থেই অসম্ভব। আমরা এমন উচ্চচাপের কর্মপরিবেশ তৈরি করেছি, যেখানে একটি চাপযুক্ত মস্তিষ্ক একটি চাপমুক্ত মস্তিষ্কের তুলনায় অনেক কম উৎপাদনশীল। আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে, বেশিরভাগ প্রকৃত শিক্ষাই আসলে বাড়িতে সম্পন্ন হতে বাধ্য হয়। এই

বইয়ের বিভিন্ন গবেষণা একসাথে করলে যা দেখা যায় তা হলো: আপনি যদি এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা তৈরি করতে চান, যা মস্তিষ্কের স্বাভাবিক কাজের পদ্ধতির সরাসরি বিরোধী, তাহলে সম্ভবত আপনি একটি শ্রেণিকক্ষের নকশা করবেন।

ঠিক তেমনই, যদি আপনি এমন এক কর্মক্ষেত্র তৈরি করতে চান, যা মস্তিষ্কের স্বাভাবিক কাজকর্মের ঠিক উল্টোপথে চলে, তাহলে সম্ভবত ছোট ছোট অফিসের পার্টিশন (কিউবিকেল) তৈরি করাই হবে আপনার প্রথম কাজ। আর যদি এই অবস্থার বদল ঘটাতে চান, তবে সম্ভবত সবকিছু ভেঙে নতুন করে শুরু করতে হবে। এর একটা বড় কারণ হলো, মস্তিষ্কের বিজ্ঞানীরা সাধারণত শিক্ষক ও ব্যবসায়ী, শিক্ষা বিভাগের প্রধান ও হিসাবরক্ষক, স্কুল পরিদর্শক ও প্রধান নির্বাহীদের (সিইও) সাথে তেমন আলোচনা করেন না। যদি আপনার চায়ের টেবিলে "জার্নাল অফ নিউরোসায়েন্স"-এর মতো গবেষণাপত্র না থাকে, তাহলে এই জ্ঞানের ভান্ডার থেকে আপনি হয়তো অনেক দূরেই থেকে যাবেন। এই বইটি মূলত সেই জ্ঞানের জগতে আপনাকে একটু ঢু মারার সুযোগ করে দেওয়ার জন্যই লেখা হয়েছে।

ব্রেইন রুলস # ১
বিবর্তন
কালের পরিক্রমায়, মানুষের সাথে মস্তিষ্কও বিবর্তিত হয়েছে

টিকে থাকা : মস্তিষ্কের বিশেষ ক্ষমতা

আমার চার বছর বয়সি ছেলে একদিন উঠোনে লাঠি নিয়ে খেলছিল।

আমি বললাম, "লাঠিটা তো বেশ সুন্দর!"

সে বলল, "এটা লাঠি না, এটা একটা ধারালো তলোয়ার! এই যে, হাত তোলো! হ্যান্ডস আপ!!"

আমিও মজা করে হাত তুললাম, আর আমরা দুজনেই হেসে উঠলাম!

পরে যখন আমি ঘরে গেলাম, তখন বুঝলাম আমার ছেলে কল্পনা করার বা চিন্তা করার এমন একটা বিশেষ ক্ষমতা দেখিয়েছে, যা বিশ্বের এতসব প্রাণীদের মধ্যে কেবল মানুষেরই আছে–আর এই ক্ষমতা তৈরি হতে লক্ষ লক্ষ বছর লেগেছে। অথচ সে এটার প্রয়োগ করতে দুই সেকেন্ডও সময় নেয়নি। একটা চার বছরের বাচ্চার জন্য এটা অবাক করার মতো ব্যাপার। অন্য প্রাণীদেরও বুদ্ধি আছে, কিন্তু মানুষের চিন্তাভাবনা অন্যরকম। কীভাবে আর কেন আমাদের মস্তিষ্কের এতটা বিবর্তন ঘটেছে?

টিকে থাকার কৌশল

শেষ পর্যন্ত সবকিছু গিয়ে দাঁড়ায় বংশগতির (Genetics) ওপর। আমাদের শরীর এমন কিছু জিনগত পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত, যা আমাদের প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে নিজেদের জিন পৌঁছে দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত সময় পর্যন্ত টিকতে সাহায্য করেছে। জীববিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় নিয়ম হলো প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তন, আর মস্তিষ্ক হলো একটি জৈবিক টিস্যু। তাই এটিও প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়ম মেনেই চলে।

একটি কঠিন পরিবেশের নিষ্ঠুরতাকে হারানোর দুটো উপায় আছে: হয় আপনি শক্তিশালী হয়ে উঠুন, না হয় আপনি আরও বুদ্ধিমান হয়ে উঠুন। আমরা দ্বিতীয়টি বেছে নিয়েছি। এটা খুবই অবিশ্বাস্য মনে হয় যে, শারীরিকভাবে এত দুর্বল একটা প্রজাতি পেশি বাড়িয়ে নয়, বরং মস্তিষ্কে নিউরনের সংখ্যা বাড়িয়ে গোটা গ্রহের কর্তৃত্ব নিয়েছে। কিন্তু আমরা তা করেছি, এবং বিজ্ঞানীরা এর কারণ খুঁজে বের

করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন। আমি চারটি প্রধান ধারণা নিয়ে আলোচনা করতে চাই, যা শুধু ব্রেইন রুলসের প্রেক্ষাপট তৈরি করে না, বরং আমরা কীভাবে বিশ্বকে জয় করেছি তাও ব্যাখ্যা করে।

দ্বৈত উপস্থাপন তত্ত্ব (Dual Representational Theory)

একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য সত্যিই আমাদের গরিলাদের থেকে আলাদা করে, তা হলো প্রতীকী যুক্তি ব্যবহার করার ক্ষমতা। যখন আমরা পাঁচ বাহুবিশিষ্ট কোনো জ্যামিতিক আকার দেখি, তখন আমরা শুধু সেটাকে একটা পঞ্চভুজ হিসেবেই দেখি না। আমরা খুব সহজেই সেটাকে মার্কিন সামরিক সদর দপ্তর হিসেবেও ভাবতে পারি। অথবা একটা ক্রাইসলার মিনভ্যান হিসেবেও কল্পনা করতে পারি। আমাদের মস্তিষ্ক একটা প্রতীকী বস্তুকে একই সাথে বাস্তব এবং অন্য কিছুর প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে দেখতে পারে। আমার ছেলে যখন তার লাঠিটিকে তলোয়ারের মতো ধরেছিল, তখন সে ঠিক এটাই করছিল। গবেষক জুডি ডিলোচ একে দ্বৈত উপস্থাপন তত্ত্ব (Dual Representational Theory) বলেন। আনুষ্ঠানিকভাবে বলতে গেলে, এটি আমাদের সেই ক্ষমতাকে বর্ণনা করে, যার মাধ্যমে আমরা এমন জিনিসগুলোর বৈশিষ্ট্য ও অর্থ আরোপ করতে পারি, যা আসলে সেগুলোর মধ্যে নেই। সহজভাবে বললে, আমরা এমন জিনিস বানিয়ে বলতে পারি, যা সেখানে নেই। আমরা মানুষ কারণ আমরা কল্পনা করতে পারি।

বিবর্তন

আমাদের প্রজাতির বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতির বেশিরভাগটাই আমরা জানতে পারি প্রাচীন হাতিয়ার তৈরির নিদর্শন দেখে। যদিও এটা সবচেয়ে নিখুঁত মাপকাঠি নয়, তবে আমাদের কাছে এটাই সেরা প্রমাণ। প্রথম কয়েক মিলিয়ন বছর ধরে এর রেকর্ড খুব একটা চিত্তাকর্ষক নয়। আমরা বেশিরভাগ সময়ই পাথর ধরে অন্য কিছুর সাথে ঘষেছি বা ভেঙেছি। বিজ্ঞানীরা মনে হয় আমাদের সম্মান বাঁচানোর জন্য এই পাথরগুলোকে "হাতের কুড়াল" (Hand axes) নাম দিয়েছেন।

আমরা এক মিলিয়ন বছর পরও সেই "হাত কুড়াল" ব্যবহার করতাম, তবে আমরা সেগুলোকে অন্য পাথরের সাথে ঘষে আরও ধারালো করতে শুরু করলাম। আমাদের কাছে আরও ধারালো পাথর ছিল। এটা খুব বেশি কিছু না হলেও, আমাদের পূর্ব আফ্রিকার উৎপত্তিস্থল এবং অন্য যেকোনো পরিবেশগত অঞ্চলের ওপর একমাত্র নির্ভরতা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য যথেষ্ট ছিল। এরপর মজার ঘটনা ঘটতে শুরু করল। আমরা আগুন জ্বালাতে শিখলাম এবং খাবার রান্না করতে শুরু করলাম।

ধীরে ধীরে, আমরা দল বেঁধে আফ্রিকা থেকে বের হতে শুরু করলাম। আমাদের একদম কাছের পূর্বপুরুষ, হোমো সেপিয়েন্স, প্রায় এক লক্ষ বছর আগে যাত্রা করেছিল। তারপর (প্রায় চল্লিশ হাজার বছর আগে) অবিশ্বাস্য কিছু ঘটল।

আমাদের পূর্বপুরুষরা হঠাৎ ছবি আঁকতে আর মূর্তি বানাতে শুরু করল, সুন্দর শিল্পকর্ম আর গয়না তৈরি করল। এই পরিবর্তনটা খুব তাড়াতাড়ি আর গভীরভাবে হয়েছিল। ত্রিশ হাজার বছর পর আমরা পিরামিড বানাচ্ছিলাম। তার পাঁচ হাজার বছর পর রকেটের জ্বালানি।

অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন আমাদের বুদ্ধির এই দ্রুত উন্নতি 'দুটো জিনিসকে একসাথে দেখার ক্ষমতা' আসার কারণে হয়েছে। আর অনেকে মনে করেন যে, এই ক্ষমতা আর এর সাথে আসা শারীরিক পরিবর্তনগুলো খারাপ আবহাওয়ার জন্য হয়েছিল।

মানুষের পুরনো দিনের বেশিরভাগ সময় কেটেছে জঙ্গলের মতো পরিবেশে: গরম, ভেজা আর ঠান্ডার তেমন দরকার ছিল না। এই পরিবেশটা আরামের ছিল আর সহজে বোঝা যেত। তারপর আবহাওয়া বদলাতে শুরু করল। গ্রিনল্যান্ড থেকে বরফের নমুনা দেখে বোঝা যায় যে, আবহাওয়া খুব গরম থেকে হঠাৎ খুব ঠান্ডা হয়ে যেত। প্রায় এক লক্ষ বছর আগে, তুমি হয়তো উত্তর মেরুর মতো ঠান্ডায় জন্মাতে পারতে, আর কয়েক দশক পরেই ঘাসের মাঠের রোদ্দুর গায়ে লাগানোর জন্য জামাকাপড় খুলে ফেলতে হতো। এই ধরনের অস্থিরতা যেকোনো প্রাণীর ওপর খুব খারাপ প্রভাব ফেলতে বাধ্য। বেশিরভাগ প্রাণীই এটা সহ্য করতে পারেনি। বাঁচার নিয়মকানুন বদলাচ্ছিল, আর নতুন ধরনের প্রাণীরা সেই খালি জায়গাগুলো পূরণ করতে শুরু করল, কারণ তাদের অনেক সঙ্গী মারা যাচ্ছিল।

এই পরিবর্তন আমাদের তথাকথিত আরামের গাছ থেকে ফেলে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল, কিন্তু নিচে পড়ে আমাদের মেরে ফেলার মতো খারাপ ছিল না। তবে নিচে নামাটা ছিল শুধু কষ্টের শুরু। গাছের বদলে ঘাসের মাঠের সামনে পড়ে আমরা 'সমতল' জিনিসটার সাথে ধাক্কা খেলাম। আমরা তাড়াতাড়ি বুঝলাম যে, আমাদের নতুন জায়গাগুলোয় আগে থেকেই অন্যেরা ছিল। তারা খাবারের উৎসগুলো দখল করে নিয়েছিল, আর তাদের বেশিরভাগই আমাদের চেয়ে শক্তিশালী আর দ্রুত ছিল। এটা ভাবতেও খারাপ লাগে যে আমরা একটা অচেনা সমতল ভূমিতে আমাদের যাত্রা শুরু করেছিলাম, যেখানে "আমাকে খাও, আমি শিকার" কথাগুলো যেন আমাদের জন্মের সঙ্গেই লেখা ছিল। আপনারা হয়তো ভাবছেন আমাদের বাঁচার সম্ভাবনা খুবই কম ছিল। যা ভাবছেন, তা সত্যি।

আমাদের একেবারে কাছের পূর্বপুরুষদের সংখ্যা হয়তো দু'হাজারের বেশি ছিল না; কারো কারো মতে তো কয়েক'শ জনের ছোটো একটা দল ছিল। তাহলে, এত দুর্বল একটা ছোটো দল থেকে আমরা কীভাবে সাত বিলিয়ন

শক্তিশালী আর ক্রমশ বাড়তে থাকা মানুষের এক বিশাল স্রোত হলাম?

স্মিথসোনিয়ানের ন্যাশনাল মিউজিয়াম অফ ন্যাচারাল হিস্ট্রির হিউম্যান অরিজিন প্রোগ্রামের পরিচালক রিচার্ড পটসের মতে এর একটাই কারণ। আমরা এক জায়গায় স্থির থাকতে চাইনি। আমরা ভাবিনি যে কোনো একটা নির্দিষ্ট জায়গায় টিকে থাকব, কারণ টিকে থাকাটা আমাদের জন্য কোনো সহজ বিকল্প ছিল না। আমরা পরিবর্তনের সাথে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছিলাম। যারা তাড়াতাড়ি নতুন সমস্যার সমাধান করতে পারত না অথবা ভুল থেকে শিখতে পারত না, তারা তাদের জিন পরের প্রজন্মে দেওয়ার মতো যথেষ্ট সময় বাঁচতে পারত না। এই বিবর্তনের ফলে আমরা শক্তিশালী হওয়ার চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান হয়ে উঠেছিলাম। এটা একটা অসাধারণ বুদ্ধি ছিল। আমরা আফ্রিকার অন্যান্য পরিবেশেও ছড়িয়ে পড়েছিলাম। এরপর আমরা পুরো পৃথিবী দখল করে নিয়েছিলাম।

পটসের তত্ত্ব মানুষের শেখা নিয়ে কিছু সহজ কথা বলে। এটা মস্তিষ্কের দুটো শক্তিশালী জিনিসের মধ্যেকার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে: একটা হলো জ্ঞানের ভান্ডার, যেখানে সব তথ্য জমা থাকে, আর অন্যটা হলো সেই ভান্ডারকে আরও উন্নত করার ক্ষমতা। প্রথমটা আমাদের বুঝতে সাহায্য করে কখন আমরা ভুল করেছি। দ্বিতীয়টা আমাদের সেই ভুল থেকে শিখতে সাহায্য করে। এই দুটো ক্ষমতাই আমাদের দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে নতুন তথ্য যোগ করতে সাহায্য করে। আর এই দুটো জিনিসই আমরা যেভাবে ক্লাসরুম আর ছোটো অফিসের কিউবিকল বানাই, তার সাথে খুবই জরুরি। আমরা স্মৃতি অধ্যায়ে এই জ্ঞানের ভান্ডার সম্পর্কে আরও ভালোভাবে জানতে পারব।

মস্তিষ্কের পরিবর্তন ক্রমবর্ধমান

প্রকৃতির সাথে মানিয়ে নেওয়া আমাদের প্রতীকী চিন্তাভাবনার সুযোগ করে দিয়েছে, কিন্তু এটা আমাদের ক্যালকুলাস আবিষ্কার করা আর ভালোবাসার গল্প লেখার মতো বিশেষ ক্ষমতাগুলো পুরোপুরি বোঝাতে পারে না। আসলে, অনেক প্রাণীই তথ্য জমা করে রাখে আর তাদের মধ্যে অনেকেই এমন জিনিস বানায়, যা তারা নতুন উপায়ে ব্যবহার করে। তবুও, শিম্পাঞ্জিরা খারাপ গান লেখে আর আমরা ভালো লিখি–ব্যাপারটা এমন না। শিম্পাঞ্জিরা ওসব লিখতেই পারে না, আর আমরা এমন গান লিখতে পারি, যার জন্য মানুষ নিউইয়র্ক ফিলহার্মোনিকের সদস্য হওয়ার জন্য সারা জীবনের জমানো টাকা খরচ করে। আমাদের বিবর্তনের ইতিহাসে নিশ্চয়ই অন্য কিছু ছিল, যা মানুষের এই বিশেষ চিন্তাভাবনার জন্ম দিয়েছে।

সেটা হলো একটা 'হঠাৎ জিনগত পরিবর্তন', যা আমাদের দুটো পায়ে সোজা হয়ে হাঁটতে সাহায্য করেছিল। কারণ গাছপালা কমে গিয়েছিল বা দূরে চলে

গিয়েছিল, আমাদের খাবারের খোঁজে অনেক লম্বা পথ হাঁটতে হতো। চার পায়ের বদলে দুই পায়ে হাঁটা আমাদের দুটো হাত খালি করে দিয়েছিল আর কম শক্তি খরচ হতো। এটা ছিল সাশ্রয়ী। আমাদের পূর্বপুরুষদের শরীর শুধু পেশি বাড়ানোর জন্য শক্তি খরচ না করে, বরং তাদের মস্তিষ্ককে আরও শক্তিশালী করার জন্য বাড়তি শক্তি ব্যবহার করত।

এটাই বিবর্তনের সবচেয়ে দারুণ সৃষ্টির দিকে নিয়ে যায়, যে অংশটা মানুষকে অন্য সব প্রাণী থেকে আলাদা করে। এটা হলো আমাদের কপালির ঠিক পেছনের দিকে থাকা ফ্রন্টাল লোবের একটা বিশেষ জায়গা, যাকে প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স বলা হয়। প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স কী কাজ করে? আমরা প্রথম ধারণা পাই ফিনিয়াস গেজ নামের এক ব্যক্তির কাছ থেকে, যিনি মস্তিষ্ক বিজ্ঞানের ইতিহাসে সবচেয়ে বিখ্যাত কাজের সময় আঘাত পাওয়া ব্যক্তি ছিলেন।

গেজ ছিলেন রেললাইন তৈরির শ্রমিক দলের একজন খুব পছন্দের সর্দার। তিনি হাসিখুশি, চালাক, পরিশ্রমী আর দায়িত্ববান ছিলেন–ঠিক সেই ধরনের ছেলে, যাকে যেকোনো বাবা "জামাই" হিসেবে পেলে গর্ববোধ করতেন। ১৮৪৮ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর, তিনি একটা লোহার রড ব্যবহার করে পাথরের গর্তে বিস্ফোরক ভরছিলেন। রডটা ছিল প্রায় এক ইঞ্চি মোটা আর তিন ফুট লম্বা। বিস্ফোরণে রডটা গেজের মাথায় ঢুকে যায়। এটা তার চোখের নিচ দিয়ে ঢুকে তার বেশিরভাগ প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স নষ্ট করে দেয়। অবিশ্বাস্যভাবে, গেজ বেঁচে যান। কিন্তু তিনি হঠাৎ করেই বেপরোয়া, আবেগপ্রবণ আর অভদ্র হয়ে যান।

তিনি তার পরিবার ছেড়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে এক কাজ থেকে অন্য কাজে ঘুরতে থাকেন। তার বন্ধুরা বলত, সে আর আগের গেজ নেই। যখন মস্তিষ্কের কোনো নির্দিষ্ট অংশে আঘাত লাগে, তখন আমরা বুঝতে পারি যে, কোনো অস্বাভাবিক আচরণ অবশ্যই সেই অংশের কাজের সাথে জড়িত। এই কারণে আমি বইতে এ ধরনের আরও কিছু ঘটনার কথা বলেছি।

গেজের ঘটনা ছিল প্রথম প্রমাণ যে প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স কিছু বিশেষ মানবিক বুদ্ধির কাজ নিয়ন্ত্রণ করে, যাকে "এক্সিকিউটিভ ফাংশন" বলা হয়–যেমন সমস্যা সমাধান করা, মনোযোগ ধরে রাখা আর মনের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা। সহজভাবে বলতে গেলে, এই অংশটা এমন অনেক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে যা আমাদের অন্য প্রাণী (আর কিশোর-কিশোরীদের) থেকে আলাদা করে।

মস্তিষ্ক: একের ভিতর তিন

আমাদের মাথার ভেতরে কেবল প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্সই নেই, এর মধ্যে তিনটে মস্তিষ্ক একসাথে আটকে আছে, আর এদের কিছু অংশ তৈরি হতে লক্ষ লক্ষ বছর লেগেছে। আপনার সবচেয়ে পুরনো স্নায়ু কাঠামো হলো ব্রেন স্টেম, যাকে